BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03050033

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 05| May 2025| e-ISSN: 2584-1890

# দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কবিতার ভাষা ও সংস্কৃতি

**Ruma Mahata**

Ph.D. Scholar, Department of Bengali, Midnapore College (Autonomous) under Vidyasagar University, Paschim Medinipur, West Bengal, Email: 1704ruma@gmail.com

**সারসংক্ষেপ:**

*ভাষা হল মানুষের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ বা ভাব বিনিময়ের মাধ্যম। সভ্যতার প্রথম দিকে মানুষ যখন ভাষাহীন ছিল তখন তারা তাদের প্রয়োজনে কিছু 'মৌখিক শব্দ' ব্যবহার করত। পরবর্তীকালে তা অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিণত হয়েছে ভাষায়। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলের কবিরা তাঁদের কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন এই অঞ্চলের মানুষজনদের ভাষা ও সংস্কৃতি। আলোচ্য এই অঞ্চলের কবিরা তাঁদের কবিতায় তুলে ধরেছেন দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ভাষা ও সংস্কৃতি কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। এই ভাষা ও সংস্কৃতিই হল দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার বেশিরভাগ কবিদের কবিতার বিষয়বস্তু।*

**সূচক শব্দ:** *কুড়ানি, বঙ্গেশ্বর, ডাহাই কুট্টি, কদলাঁঞ, ঘাঁটেঞ, আখ্যান যাত্রা।*

**মূল আলোচনা:**

মানুষের ভাষা হল পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ বা ভাব বিনিময়ের মাধ্যম বা উপায়। সভ্যতার প্রথম দিকে মানুষ যখন ভাষাহীন ছিল তখন তারা তাদের প্রয়োজনে কিছু 'মৌখিক শব্দ' ব্যবহার করত। পরবর্তীকালে অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই তা ভাষায় পরিণত হয়েছে। এই সমস্ত ভাষাকে নিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষাবিজ্ঞান।[১] ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে ভাষার মূলত দুটি রূপ। যথা— একটি মৌখিক বা কথ্য অর্থাৎ মুখের ভাষা, অন্যটি লিখিত অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষা। এই ভাষাকে আশ্রয় করেই মানুষের মননশীলতার প্রকাশ ঘটেছে। বলাবাহুল্য, মানুষের ভাষার মৌখিক প্রকাশই হল প্রাচীনতম। মৌখিক ভাষায় হল আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ ও কৌতূহল। যেকোনো ভাষার ক্ষেত্রেই তুলনামূলকভাবে ভাষার লিখিত রূপের নিদর্শন অর্বাচীন কালের ব্যাপার। তবু ভাষায় লিখিত রূপের ক্ষেত্রে মৌখিক রূপের কোনটিকে কতটুকু আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হবে সে ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক বাদ-প্রতিবাদ চলে এসেছে। মৌখিক কথ্য বাংলা ভাষার আঞ্চলিক রূপকে অবলম্বন করেও যে কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাকেই আমরা আঞ্চলিক কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করেছি। আমাদের আলোচ্য অঞ্চলের কবিরা তুলনামূলক ভাবে আঞ্চলিক বাংলা ভাষাতেই বেশি কবিতা রচনা করেছেন। এই অঞ্চলটিতে মূলত ঝাড়খণ্ডী উপভাষার প্রচলন রয়েছে। নানা ভাষা ও বিদ্যার অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন যে, যে কোনও জীবন্ত ভাষা পরিবর্তনশীল। তা অগ্রসর হয় অনবরত গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে। এর ফলস্বরূপ শুধুমাত্র ভাষার শব্দরূপেরই পরিবর্তন ঘটে তা নয়, বরং শব্দার্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই পরিবর্তন চিরপ্রবাহমান আঞ্চলিক রীতিতে আরও ব্যাপক।[২] ভাষাগত দিক দিয়েও আঞ্চলিক কবিতার গুরুত্ব অপরিসীম। একটা সময় ভাষার প্রকৃত রূপের পরিচয় নির্ণয়

করা সুকঠিন বলে প্রতিভাত হয়। তার মূল কারণ লিখিত রূপের অপ্রতুলতা। পরবর্তীকালে ভাষারূপের বিবর্তনের সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে আধুনিক যুগে মৌখিক বা কথ্য ভাষার লিখিত রূপ। কিংবা আজকের আঞ্চলিক ভাষার মধ্যেই হয়তো ভাষার অতীত দিনের প্রত্নরূপের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আঞ্চলিক কবিতার প্রধান চর্চা কেন্দ্র হিসেবে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলটির ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করব।

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা অঞ্চলে যে ভাষায় রচিত কবিতার চর্চা হয় তা মূলত আঞ্চলিক বাংলা ভাষার কবিতা। এই আঞ্চলিক বাংলা ভাষার কবিতা চর্চা কতদিন আগে থেকে শুরু হয়েছিল তা নিয়ে আজও পণ্ডিত মহলে বিতর্ক রয়েছে। দেবব্রত সিংহ এ প্রসঙ্গে বলেছেন— বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থীরা যেদিন লোকসমাজের কাছে তথাগতের বাণী ও সাধন প্রণালীকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য লোক সাধারণের ভাষায় নির্মাণ করেছিলেন চর্যাগীতি, সেদিনই প্রথম বাংলার লোককবিতা রচিত হয়েছিল। তিনি লোককবিতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, চর্যাপদের কবিদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন তথাকথিত নিম্নবর্গের বা অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষ। চর্যাপদের সময়ে সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথার প্রচলন ছিল। তাই তাঁরা উচ্চবর্ণের মানুষদের দ্বারা অবহেলার শিকার হয়েছিলেন। এই অবহেলার জন্যই তাঁরা উচ্চবর্গের মানুষদের ভাষা (সংস্কৃত ভাষা) কে ব্যবহার না করে লোকসমাজে ব্যবহৃত ভাষাকে তুলে ধরেছিলেন।[৩]

এই চর্যাপদে উপভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন বলেছেন— "The language of the Charya songs is basically vernacular, but at the same time it is also something of a literary language".[৪]

শুধুমাত্র আদিমযুগের প্রাচীনকাব্য চর্যাপদে নয়, মধ্যযুগে রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যেও এই লোকভাষার ব্যবহার দেখা যায়। তিনি মধ্যযুগের এই রচনাতেও উপভাষা প্রসঙ্গে বলেছেন— "Middle Bengali as a whole appears as a pan-Bengali literary language based mainly on the dialect of West Bengal."[৫]

আদিযুগের কাব্য 'চর্যাপদ' ও মধ্যযুগের কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'— এই দুই রচনাতেই উপভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে কালিদাস ভদ্র বলেছেন— "ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে বহুকাল আগে থেকেই আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা চর্চার শুরু। বাংলা ভাষার আদিপর্যায়ের দৃষ্টান্ত 'চর্যাগীতি' নিশ্চিতভাবে কোনো উপভাষার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। চর্যাপদের পর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কাব্য ভাষাকেও আঞ্চলিক বলা হয়ে থাকে। সীমান্ত রাঢ়ী বা ঝাড়খণ্ড, মেদিনীপুর অঞ্চলের বাংলা ভাষ্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে আঞ্চলিক তাৎপর্য দিয়েছে।"[৬] 'চর্যাপদ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'- এ ব্যবহৃত ভাষা কিংবা মধ্যযুগে যে কোন কাব্যে ব্যবহৃত ভাষায় রচিত কোন সাহিত্যকর্মকে আমরা আঞ্চলিক কাব্য বা আঞ্চলিক কবিতা বলতে পারি না। তার কারণ আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না যে, ভাষা প্রয়োগই কোন কাব্য আঞ্চলিক হয়ে ওঠে কিনা— এই নিয়ে পণ্ডিতমহলে বির্তক রয়েছে। পণ্ডিতেরা অনেকেই বিশ্বাস করেন আঞ্চলিক ভাষাই হল আঞ্চলিক কবিতার মানদণ্ড। অর্থাৎ মধ্যযুগে যে বাংলা ভাষার ব্যবহার হতো সেই ভাষাই কাব্যে প্রয়োগ হয়েছে। কিন্তু আধুনিক যুগে এসে বাংলা ভাষার অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ-রীতিরও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। তাই বলা যায় বাংলা কবিতার আঞ্চলিক রূপ আধুনিক যুগেরই সৃষ্টি। আদি ও মধ্যযুগে বাংলা কাব্য রচিত হয়েছে দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকে নিয়ে। সেই ধর্মীয় বাতাবরণের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন আধুনিক যুগের কবি সাহিত্যিকরা। তাঁদের কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছে সাধারণ মানব-মানবী। তাই আমরা 'চর্যাপদ' বা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ থাকলেও গ্রন্থ দুটিকে আঞ্চলিক কাব্য বলতে পারি না। এই প্রসঙ্গে বরুণকুমার চক্রবর্তী বলেছেন— "জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এঁদের যদি বাদও দিই, এমনকি রবীন্দ্রনাথের লেখা অধিকাংশ কবিতাই কি মানুষের উপভোগ্য? কবিতার প্রতিটি শব্দ তাৎপর্যমণ্ডিত। সেগুলির অনুষঙ্গ, ব্যঞ্জনা সকলের অধিগম্য নয়। তাই এখনকার দিনে কাব্যচর্চার সঙ্গে মুষ্টিমেয় মানুষের যোগ-বৃহত্তর মানব সমাজ নিরক্ষর, তারা এর থেকে দূরে অবস্থান করে। কোনো যোগসূত্র গড়ে ওঠেনি। অথচ আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্য, যা ছিল একান্তভাবে গীতি সাহিত্য বা কাব্য সাহিত্য তার সঙ্গে বৃহত্তর মানব সমাজের ছিল নিবিড় যোগ। এমনকি নিরক্ষর মানুষ যেন মধ্যযুগীয় কাব্যকলার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। মধ্যযুগীয় বাতাবরণ আধুনিক যুগে যে মিলবে না তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া এখনকার কাব্য গুণগত উৎকর্ষে অনেক বেশি উচ্চমানের এবং দুরূহ, এই প্রেক্ষিতে

আঞ্চলিক কবিতার আত্মপ্রকাশ আঞ্চলিক ভাষার কবিতা রচনার লক্ষ্য উদ্দেশ্য অধিসংখ্যক আঞ্চলিক মানুষের কাছে পৌঁছানো। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত নাগরিক পাঠকের বৃত্তকে ভেঙে পাঠক সমাজের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা।"[৭]

আধুনিক আঞ্চলিক বাংলা কবিতার দুজন কবি হলেন— মণীশ ঘটক ও অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। কবি মণীশ ঘটক- এর জন্ম ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ও মৃত্যু ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর তিরিশের দশকের রচিত বিখ্যাত কবিতা 'কুড়ানি'। এই কবিতাতেই প্রথম আমরা বঙ্গালী উপভাষার প্রয়োগ দেখতে পাই। এই কবিতাটির সমগ্র অংশে আঞ্চলিক ভাষা অর্থাৎ বাঙ্গালি উপভাষার প্রয়োগ দেখা যায় না, কেবলমাত্র কিছু কিছু চরিত্রর সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে এই আঞ্চলিক ভাষা। যথা, মণীশ ঘটকের 'কুড়ানি' কবিতায়—

"স্ফীত নাসারন্ধ্র, দুটি ঠোঁট ফোলে রোষে
নয়নে আগুন ঝলে।"[৮]

কবি মণীশ ঘটকের লেখা কবিতাতে আমরা আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার দেখতে পাব। কবিতা দুটি হল— 'বঙ্গেশ্বর' ও 'ডাহাই কুট্টি'। 'বঙ্গেশ্বর' কবিতাটি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত এবং 'ডাহাই কুট্টি' কবিতাটি রচিত ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে। কবিতা দুটি আঞ্চলিক ভাষা অর্থাৎ বাঙ্গালী উপভাষায় রচিত। 'বঙ্গেশ্বর' কবিতাটি হল—

"দশগজ রেঞ্জেও দশহাত দূর দিয়ে গুলি বেরিয়ে গেল।
সাইক্লিস্ট ঘাড় বেঁকিয়ে চেঁচিয়ে বলে গেল,
জিগাইলে কইয়ো,
মামলাত লইয়া আমি ভাবলাম।"[৯]

কবি মণীশ ঘটক সরাসরি আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ করেননি, শুধুমাত্র কয়েকটি চরিত্রের সংলাপে ব্যবহার করেছেন। আমরা বলতে পারি যে, প্রথম আঞ্চলিক ভাষার পথপ্রদর্শক কবি মণীশ ঘটককে।

এরপর আলোচনা করবো কবি অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা। কবি অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ও মৃত্যু ২০১২ খ্রিস্টাব্দে। আঞ্চলিক বাংলা কবিতা জগতে কবি অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরিচিতি ব্যাপক। তাঁর আঞ্চলিক ভাষায় রচিত কবিতার বই 'সাঁঝ বিহান' ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। যদিও এই বইয়ের কবিতাগুলি অনেক আগেই লেখা। তিনি মূলত ঝাড়খণ্ডী উপভাষা ও বঙ্গালী উপভাষাতে কবিতা রচনা করতেন।

ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় রচিত 'কাঁড়াতে বোল উইঠেছে' কবিতা হল—

"রাধিকা হে তুমার প্রাণে আংরা জ্বালা
ওই বাঁশি বাঁজাই আসছে কালা
তুমার আগুনে জল ঢালতে
ইধার উধার ভাইলছ কেনে
...
ই খবর রসের নাগর জামিনে গেল সব্বজন
কাঁড়াতে বোল উইঠেছে উথাল পাথাল বিন্দাবন।"

আমাদের আলোচ্য দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলে মূলত ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় কবিতা রচিত হয়। সত্তরের দশকের কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় প্রথম বাংলা আঞ্চলিক কবিতা রচনা করেন। আঞ্চলিক বাংলা কবিতা রচনা প্রসঙ্গে কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন— "সাতের দশকে কুম্ভকর্ণের মতো ঘুম ভাঙল পুরুলিয়া শহরের। একদিন 'ছত্রাক'কে কেন্দ্র করে মানভূম সংস্কৃতি অন্যদিকে 'আমরা সত্তরের যিশু'— আধুনিক সাহিত্যের আন্দোলন শুরু করল। কবিতা

পাঠ, সাহিত্যের আড্ডা,কবি সম্মেলন সারা জেলাকে সবুজ সতেজ ও প্রাণবন্ত করে তুলল। সেইসঙ্গে মানভূমী কবিতাও লেখা শুরু হল দল বেঁধে। সুবোধ বসুরায়, সৃষ্টি মাহাতো, অনিল মাহাতো, গৌতম দত্ত, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করলেন আঞ্চলিক উপভাষায় কবিতা লেখা। প্রতীক চিত্রকল্পের ব্যবহারে, ভাষার অসামান্য ব্যঞ্জনায় ধ্রুপদী আবহমণ্ডলে এক বিচিত্র রূপলোক সৃষ্টি হল।"[১০]

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবি ও তাঁদের কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে—

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ('মাড় ভাতের লড়াই', ১৯৮৫), ভবতোষ শতপথী ('অরণ্যের কাব্য', ১৯৯২, 'শিরি চুনারাম মাঁহত'), ছত্রমোহন মাহাত ('মায়ামঙ্গল', ২০১০), অভিমুন্য মাহাত ('মাটি') প্রমুখ।

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কবিরা বেশির ভাগ আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় কবিতা লিখেছেন বা লিখছেন। তাঁরা তাঁদের কবিতার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের খেটে খাওয়া, দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের জীবন-যাপন, ভাষা ও সংস্কৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন— "আঞ্চলিক উপভাষার কবিতা এখন আর কবিতার মানচিত্রে উপেক্ষিত অনাদৃত এবং কারও করুণাপ্রার্থী তপশিলী উপজাতি হরিজন সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। বহু তর্ক-বিতর্কের সিঁড়ি পার হয়ে এ কবিতা আজ মানুষের মনে স্বমর্যাদায় স্থান করে নিয়েছে। এদেশের জল হাওয়া মাটির গন্ধ মাখা এইসব কবিতার ধর্ম আলাদা চরিত্র আলাদা। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের শব্দে ভাষায় কবিতাগুলি যেমন সমৃদ্ধ তেমনি দৈনন্দিন জীবনের সার্থক প্রতিফলন এই কবিতায় ঘটেছে।"[১১]

আমাদের আলোচ্য দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলে যেসমস্ত জাতি বা সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে তা নিম্নরূপ— মাঝি, বাগাল, মাল, তাঁতী, কেওট বা কৈবর্ত, সাঁওতাল, ভূমিজ, মুন্ডা, লোধা, শবর, খেড়িয়া, কুর্মি-মাহাত প্রভৃতি। উপরে উল্লেখিত সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনকাহিনী, ভাষা ও সংস্কৃতি হল এই অঞ্চলের কবিতার মূল বিষয়বস্তু। এই অঞ্চলে মূলত ঝাড়খণ্ডী উপভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—

১। নামধাতুর বহুল ব্যবহার এই উপভাষার দেখা যায়।

উদা.— 'কদলাঞ উধানঞ কাদা ঘাঁটেঞ।'

২। এই অঞ্চলের উপভাষায় 'ল'>'ন' রূপে এবং 'ন'>ল' রূপে উচ্চারিত হয়।

উদা.— 'ই ঘোড়াটো তুমার লয়'

৩। সর্বনাম পদের ব্যবহার দেখা যায়।

উদা.— 'তুদের কাছে উ তো শুধু নদী।'

৪। অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে 'ইয়া' বা 'ইয়ে' স্থানে আনুনাসিক '-ইঞ', '-য়েঁ' উচ্চারিত হয়ে থাকে।

উদা.— "বাইগন পাইড়বেক আঁগসি লাগাঞ।"

অনেক আধুনিক কবি মনে করেন যে, লোক জীবনের মুখের ভাষার মধ্য দিয়েই তাদের জনজীবন ফুটিয়ে তোলা যায়। এই আঞ্চলিক ভাষা শুধুমাত্র রসসাহিত্য নয়, এই অঞ্চলের মানুষদের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই প্রসঙ্গে উৎপল কুমার মণ্ডল বলেছেন— "যেকোনো ভাষার ভিত্তিভূমি তার আঞ্চলিক কবিতা ও অন্যান্য সাহিত্য, যাকে এককথায় লোকসাহিত্য বলা যায়। লোকসাহিত্য কোনো কোনো সময় আদর্শ সাহিত্যের চাপে হারিয়ে যেতে বসে। বর্তমানে আধুনিক কবিতা আন্দোলনের অন্যতম একটি ধারা। তাই আঞ্চলিক কবিতা চর্চার প্রবণতা আসলে শিকড়ের কাছে ফিরে যাওয়ারই চেষ্টা।"[১২]

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কবিতার ভাষা ও সংস্কৃতি দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কবিদের কবিতায় যেমন আমরা নিজস্ব ব্যক্তিভাষার প্রতিফলন দেখতে পেয়ে থাকি; ঠিক একই ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে সমষ্টিগত প্রাণের চেতনারও আসনে ঐতিহ্য বা পরম্পরার পটভূমিকে স্বীকৃতি জানিয়েই দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এই কবিতার জগত ভাস্বর হয়ে আছে। এই ঐতিহ্য যেমন বাংলার মানুষের, ভাষার, সমাজের তেমনি সংস্কৃতিরও। এই অঞ্চলের কবিদের কবিতার ভাষার স্বতন্ত্র পরিসর হল লোকজ, একান্ত দেশজ উপাদান নিয়ে লেখা। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলে আমরা একদিকে দেখতে পাই কবিতার ভাষা ও সংস্কৃতির শিকড় অন্যদিকে নবতম মনন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ভূমিতে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে বহুবিধ প্রভাব। এই প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে অনেকে বলেছেন— একদিকে সুপ্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য অন্যদিকে নবাগত পাশ্চাত্য সাহিত্যের হাত ধরেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উপর অন্য সাহিত্যের প্রভাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রথমতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব, দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব। আধুনিককালের কবিরা লোকসংস্কৃতিকেও মান্যতা দিয়েছেন। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কাব্যভুবন অধিকার করে থাকে তাই জেলের ছেলে, জেলের মেয়ে, মালোর মেয়ে, অন্ধ বধূ বা কাজলা দিদি। পল্লীকেন্দ্রিক বিষয় নির্বাচনে কবির লোকজ সংস্কৃতি ও লোকজীবনের প্রতি তন্নিষ্ঠার কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

আলোচ্য এই অঞ্চলের কবিদের প্রেরণা লৌকিক ঐতিহ্য ও লৌকিক জীবন-সংস্কৃতি। বাংলার সাংস্কৃতির মৃত্তিকার গভীরে তাদের মূল বা শেকড় প্রোথিত আছে। হাজার হাজার বছরের লোকায়ত সংস্কৃতির নানা উপাদান আঞ্চলিক কবিতার জগতকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে।দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলে জনপ্রিয় উৎসব হল লৌকিক দেবী টুসুকে কেন্দ্র করেই এই উৎসব পালিত হয়। টুসু উৎসবের শুভারম্ভ অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি থেকে। টুসু পূজার আয়োজন আরাধনা চলে সারা পৌষ মাস ধরে। সমাপ্তি পৌষ সংক্রান্তিতে। টুসুর বিসর্জন হয় আখ্যান যাত্রার দিনে অর্থাৎ ১লা মাঘ। কবি সুভাষ রায়ের ‘পউষ মাসে’ কবিতায় আমরা লোকায়ত টুসু গানের ব্যবহার পাই।—

“তিরিশ দিন রইল্যে টুসু
তিরিশটা ফুল পাল্যে গো
যাচ্ছ যাচ্ছ যাচ্ছ টুসু,
লিতে গেলে আস্য গো
পহিল পউষে আইসবে টুসু
মকর দিনে যাবে গো।” (‘পউষ মাসে’)

কবি ভরতচন্দ্র মাহাত-র কবিতায় লোকসংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়—

“বিশ পৈসার পানখিলি চা খাওয়াবি বৈলেঁছিলি
মনের আশা মনেই রৈহেঁ গেল।” (‘কুল রাখা ভার’)

বাঁদনা পরবের কথা কবি ঈশ্বর ত্রিপাঠী তাঁর কবিতায় লিখেছেন—

“মাঝে মাঝে বাঁধনা পর্ব
কাড়া খুট্যান দ্যাখতে আসে।” (‘লোক কবিতা’)

কবি যুগল কিশোর মাহাত তাঁর কবিতায় করম পরবের কথা উল্লেখ করেছেন—

“ঝিঙা ফুল ফুটছে লতে বাদাড় আলঅ করি—
দুদিন পরে আইসছে করম কেমনে কেমনে ধরি।” (‘ঝিঙাফুল ফুটছে’)

কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘ভাদু পূজাটো’ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"জলে হেলা জলে খেলা জলে তুমহার কে আছে

লিজের মুইনে ভাইবে দেখ জলে শ্বশুর ঘর আছে।" ('ভাদু পূজাটো')

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতি কবিদের কবিতার উৎকর্ষ সাধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। আমাদের আলোচ্য এই অঞ্চলে যে যে সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে তাদের মধ্যে প্রধান দুটি জনগোষ্ঠী হল— সাঁওতাল এবং মাহাত বা কুর্মী সম্প্রদায়। এছাড়া আছে ভূমিজ, বাগদী, বাউরী, মাল, হাড়ি, মুচি, ডোম, লোধা, খাড়িয়া, শবর, কাহার, কুর্মী— এর মধ্যে সাঁওতালরা তাদের নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে এখনও স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান। এছাড়া মাহাত— যারা নিজেদের কুর্মী আদিবাসী বলে পরিচয় দেয় তাদেরও ভাষা সংস্কৃতির ধারাটিকে মূল স্রোতের সঙ্গে যোগ করেও স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধির পথে বহমান— তারা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির রক্ষা ও প্রসারে আজ সংগ্রামশীল।

**তথ্যসূত্র:**


১। মণ্ডল নমিতা, বাঁকুড়া কেন্দ্রিক মল্লভূমের উপভাষা, বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি অকাদেমি, বাঁকুড়া, ২য় মুদ্রণ ১৯৬৪ (মুখবন্ধ অংশ)

২। শহীদুল্লাহ মুহাম্মদ, বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (অখন্ড)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ। ২য় মুদ্রণ ২০০০ (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৫), (প্রসঙ্গ কথা অংশ)

৩। সিংহ দেবব্রত, বাংলা আঞ্চলিক কবিতা সংগ্রহ, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে, ২০১০, পৃষ্ঠা. ৭

৪। Sen Sukumar, History of Bengali Literature, Sahitya Academi, New Delhi, First Published, January 1960, Page-6

৫। Sen Sukumar, History of Bengali Literature, Sahitya Academi, New Delhi, First Published, January 1960, Page-6

৬। ভদ্র কালিদাস, আঞ্চলিক ভাষার আবৃত্তির সেরা কবিতা, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, কলকাতা— ৯, তৃতীয় প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪২১, পৃষ্ঠা. ৩

৭। চক্রবর্তী কুমার বরুণ, প্রসঙ্গ আঞ্চলিক কবিতা, বীজেশ সাহা সম্পাদিত প্রতিভাসের কবিতা প্রতিমাসে, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, (বাংলা আঞ্চলিক কবিতা সংখ্যা) প্রতিভাস, কলকাতা, এপ্রিল— ২০০৭, পৃষ্ঠা. ১৯

৮। ঘটক মণীশ, কুড়ানি, উত্তম দাশ সম্পাদিত আঞ্চলিক ভাষার কবিতা, মহাদিগন্ত, বারুইপুর কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০১, জানুয়ারি, ২০০৬, মুদ্রণ, পৃষ্ঠা. ১৭

৯। ঘটক মণীশ, রক্তাক্ত প্রতীক্ষা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা— ৯, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮, পৃষ্ঠা. ১

১০। গঙ্গোপাধ্যায় মোহিনীমোহন, পুরুলিয়া জেলার সাহিত্য চর্চা, অতীত ও বর্তমান, অহল্যাভূমি পুরুলিয়া (১ম পর্ব) সম্পাদনা, দেবপ্রসাদ জানা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা—৬, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি- ২০০৩, পৃষ্ঠা. ১৯১

১১। গঙ্গোপাধ্যায় মোহিনীমোহন, বাংলা আঞ্চলিক কবিতা, কবিতা পাক্ষিক, কলকাতা ২৬, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা. ৫

১২। চক্রবর্তী কুমার বরুণ: প্রসঙ্গ আঞ্চলিক কবিতা, বীজেশ সাহা, সম্পাদিত কবিতা প্রতিমাসে, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, বাংলা আঞ্চলিক কবিতা সংখ্যা, প্রতিভাস, কলকাতা, এপ্রিল, ২০০৭, পৃষ্ঠা. ১৯

**গ্রন্থপঞ্জি:**

- **আকর গ্রন্থ:**

১। গঙ্গোপাধ্যায় মোহিনীমোহন, মাড় ভাতের লড়াই (কাব্য), এ. কে. ডিস্ট্রিবিউটার্স, পুরুলিয়া, পঞ্চম সংস্করণ, মাঘ ১৪১৪ (প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৯৩)

২। শতপথী ভবতোষ, ভবতোষ রচনা সমগ্র, বর্ণমালা, ৯/৪ বি প্যারিমোহন সুর লেন, কলকাতা— ৬, ১লা বৈশাখ, ১৪২৫

- **সহায়ক গ্রন্থ:**

১। কর্মকার জলধর, জঙ্গলমহল থেকে পুরুলিয়া এক রক্তাক্ত অধ্যায়, দেবপ্রসাদ জানা সম্পাদিত অহল্যাভূমি পুরুলিয়া ১ম পর্ব, দীপ প্রকাশন, কলকাতা— ৬, ২০০৩

২। ঘটক মণীশ, কুড়ানি, উত্তম দাশ সম্পাদিত আঞ্চলিক ভাষার কবিতা, মহাদিগন্ত, বারুইপুর কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০১, জানুয়ারি, ২০০৬, মুদ্রণ

৩। ঘটক মণীশ, রক্তাক্ত প্রতীক্ষা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮

৪। চক্রবর্তী বরুণ কুমার, প্রসঙ্গ আঞ্চলিক কবিতা বীজেশ সাহা সম্পাদিত প্রতিভাসের কবিতা প্রতিমাসে, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, (বাংলা আঞ্চলিক কবিতা সংখ্যা) প্রতিভাস, কলকাতা, এপ্রিল — ২০০৭

৫। চক্রবর্তী বরুণ কুমার, প্রসঙ্গ আঞ্চলিক কবিতা, বীজেশ সাহা সম্পাদিত প্রতিভাসের কবিতা প্রতিমাসে, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, (বাংলা আঞ্চলিক কবিতা সংখ্যা) প্রতিভাস, কলকাতা, এপ্রিল– ২০০৭

৬। ভদ্র কালিদাস, আঞ্চলিক ভাষার আবৃত্তির সেরা কবিতা এস. বি. এস. পাবলিকেশন, কলকাতা- ৯, তৃতীয় প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪২১

৭। মণ্ডল নমিতা, বাঁকুড়া কেন্দ্রিক মল্লভূমের উপভাষা, বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি অকাদেমি, বাঁকুড়া, ২য় মুদ্রণ ১৯৬৪ (মুখবন্ধ অংশ)

৮। শহীদুল্লাহ মুহাম্মদ, বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (অখন্ড)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ। ২য় মুদ্রণ ২০০০ (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৫), (প্রসঙ্গ কথা অংশ)

৯। সিংহ শান্তি, টুসু লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা— ৬৮, ১৪০৫

১০। সিংহ শান্তি, ভাষা আন্দোলন ও টুসু গান, দেবপ্রসাদ জানা সম্পাদিত অহল্যাভূমি পুরুলিয়া ২য় পর্ব দীপ প্রকাশন, কলকাতা— ৬, ২০০৪

১১। Sen Sukumar, History of Bengali Literature Sahitya Academi New Delhi, First Published, January 1960

**Citation:** **Mahata. R.,** (2025) "দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কবিতার ভাষা ও সংস্কৃতি", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-05, May-2025.